গ্রামীণ নারী দিবস

ভাবতে হবে গ্রামীণ নারীদের কথা

ঋষিকা

নারীর অগ্রগতি, নারীর অধিকার। এইসব ভারী ভারী আলোচনায় নেওয়া সিদ্ধান্ত কতটা আমাদের দেশের গ্রামীণ নারীকেন্দ্রিক হয়ে থাকে সেই প্রশ্নের সঠিক জবাব এখনো কোথাও আছে বলে মনে হয় না। নীতিনির্ধারক ও অধিকারকর্মীদের কাছে সার্বিক একটা হিসাব থাকলেও গ্রামীণ নারীদের জন্য যে ভিন্ন ব্যবস্থা থাকা দরকার তা খুব কম চোখে পড়ে। সেগুলো চলে যায় উপকূলীয় আর বানভাসি নারীদের কোটায়। আবার সেক্ষেত্রেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপও থাকে না। প্রতিবছর ১৫ অক্টোবর পালন করা হয় বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস। গ্রামের নারীদের অধিকার আর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই দিবসটি পালিত হয়ে থাকে।

গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

নগরকেন্দ্রিকতায় মোড়ানো বেশির ভাগ সংগঠন নারী অধিকার আদায়ে সোচ্চার হলেও গ্রামীণ নারীরা প্রতিবাদে সুর মেলাতে পারছেন না পুরোপুরিভাবে। দিবসটি বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশ একযোগে পালন করছে। আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৯৯৫ সালে। বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের চতুর্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে। এরপর ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'উইমেনস ওয়ার্ল্ড সামিট ফাউন্ডেশন' দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। দিবসটি গ্রামীণ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণসহ নানা ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে দেয়। সেই সঙ্গে মনে করে দেয় গ্রামীণ নারীদের পারিবারিক নির্যাতন আর কর্মক্ষেত্রে নানা বৈষম্যকে। গ্রামীণ উন্নয়ন, খাদ্যনিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণসহ নানা ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে বিশ্বজুড়ে।

গ্রামীণ নারীদের কাছে এই দিবস

গ্রামীণ নারীরা আসলে জানেনই না এই দিবস বলে কিছু একটা আছে। তারা না এর মর্ম বোঝেন, না এই বিষয়ে তারা আগ্রহ দেখান। কারণ তাদের কোনো কিছুতেই এই দিবসের ছাপ তারা দেখতে পান না। দিবসটি শহরকেন্দ্রিকভাবে পালন করে আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। উপকূলের নারীটি জানেন কিভাবে তাকে লবনাক্ততার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। বানভাসি নারী জানেন কিভাবে তাকে বেঁচে থাকতে হবে পানির সঙ্গে লড়াই করে। কৃষিকাজে ব্যস্ত নারী জানে কিভাবে ফসল ফইিয়ে মাঠে খেটে সংসারের হাল ধরতে হবে। এর বাইরে তাদের অধিকার বা প্রাপ্তি নিয়ে জানার ইচ্ছা বা জ্ঞানের ব্যাপ্তি নেই বললেই চলে। আর এভাবেই চলে যাচ্ছে তাদের জীবন ও জীবিকা। যেখানে থাকে উত্থান ও পতন। যার সঙ্গে বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রের লেনদেন থাকলেও সেই তথ্য গিয়ে পৌঁছায় না তার ঘরে। সে শুধু খেটে মরে নিজের পেটের দায়ে।

গ্রামীণ নারী ও বৈষম্য

অধিকারের কথা বলা হলে সেখানে আসে আর্থিক, সামাজিক ও নাগরিক অধিকারের কথা। সমঅধিকার যেখানে নিশ্চিত করা যাবে না সেখানে বৈষম্যটা দাঁড়িয়ে পরে লৈঙ্গিক পর্যায়ে। এখনো বিভিন্ন কাজে নারীরা পুরুষের চেয়ে দুই গুণ কম পারিশ্রমিক পান। যেখানে তাদের কাজের মাত্রা ও ধরন একই থাকে। পুরুষেরা শারীরিকভাবে শক্তিশালী হলেও নারীদের মাপা হয় একই দাঁড়িপাল্লায়। কাজ হলে তবেই মিলবে বেতন। যেখানে পুরুষ আর নারীর সংসারে একই অবদান থাকে। নিম্ন আয়ের মানুষগুলোর ক্ষেত্রে তারা সংসার চালায় সমান সমান আর্থিক সাহায্য নিয়ে। নারীর শারীরিক দুর্বলতা সেখানে সামাজিক ও আর্থিকভাবে প্রাধান্য পায় না।

গ্রামীণ নারীদের জন্য উদ্যোগ

বিভিন্ন ব্যাংক, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো গ্রামীণ নারীদের নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। সংস্থাগুলো নারীদের ঋণ কিংবা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যাতে তারা জীবিকার পথ বেছে নিতে পারে। এভাবে গ্রামের অনেক নারীই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে ও জীবনের মান উন্নয়ন করতে সফল হয়েছে। এমনকি তাদের দ্বারা আরও অনেকেই জীবনে নতুন কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেতে সহায়তা পেয়েছে। তবুও শুধু জীবিকাই শেষ কথা নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে আছেন গ্রামীণ নারীরা।

গ্রামীণ নারীদের শিক্ষা

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করা সম্ভব হলেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামের শিক্ষার্থীরা এখনো অনেকটা পিছিয়ে। বাংলাদেশে শিক্ষার হার প্রতিনিয়ত যে হারে বাড়ছে সে তুলনায় গ্রামের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষায় তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে। গ্রামের নারী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা নামক অগ্রযাত্রায় শামিল হতে না পারার পেছনে অনেক প্রতিবন্ধকতা কাজ করে। প্রথমেই আসে গ্রামীণ সমাজে বৈষম্যমূলক চিন্তাভাবনা। প্রান্তিক সমাজের বেশিরভাগ পরিবারে ভাবা হয়, মেয়েরা ঘরের শোভা। কেবল সাক্ষর কিংবা সন্তানাদিকে অক্ষরজ্ঞান দিতে পারার সক্ষমতাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে নারীর শিক্ষা অর্জন মাধ্যমিকেই সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয়ত, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজমান কুসংস্কারের প্রভাব। কিছু পরিবারের আর্থিক সংগতি থাকলেও ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, অবরোধ প্রথা ইত্যাদির জন্য মেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষায় উৎসাহী করা থেকে বিরত রাখে। একবিংশ শতাব্দীর এই লগ্নে এসেও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মেয়েদের ১৮ বছরের পূর্বে সাবালিকা হলেই বিয়ে দেওয়া হয়। আর বিয়ের পরে পড়াশোনা চলমান থাকে, এমন শিক্ষার্থী খুবই কম।

এই বৈষম্যের শেষ কোথায়

দেশের উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিবেচনায় গ্রামের নারী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার হার শহরের তুলনায় অনেক বেশি। একটি

পরিবারকে সুরক্ষা দিতে একজন উচ্চশিক্ষিত নারী যে অবদান রাখতে পারে তা অতুলনীয়। এছাড়া পরিবারের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নেও তারা অনবদ্য অবদান রাখতে পারেন। গ্রামের একজন শিক্ষার্থীর মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা বিকাশের অনিবার্য ধাপ উচ্চশিক্ষা অর্জন। তাই গ্রামে নারী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহী করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রামীন নারী ও বিশ্ব

উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও গ্রামীণ নারীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ নারীরা প্রধানত কৃষিকাজে পুরুষদের পাশাপাশি নিয়োজিত থাকে। উন্নয়নশীল দেশে শতকরা ৪৩ ভাগ নারীরা কৃষিকাজে অবদান রাখে। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশের গ্রামীণ নারীরা পরিবারের জন্য রান্না করা, পরিবারের দেখভাল করা, সন্তান লালন-পালন, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশুপালন ইত্যাদি কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। এই উপমহাদেশের সমস্যা হলো তারা ধরেই নেন গ্রামীণ নারীরা শুধুমাত্র কৃষি কাজ করবে, গবাদিপশু পালন করবে আর সংসার করবে। এর বাইরে তাদের তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই বলেই ধরে নেওয়া হয়। তবে এর বাইরেও যে তাদের একটা উন্নত জীবন দরকার এটা কারো মনে হয় না। তাদের জন্য শিক্ষা ও সঠিক আয়ের কাজ নির্বাচন করা কারো কাছে তেমন একটা গুরুত্ব পায় না। এইসব নারীরা তাদের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে যতটা নিজেকে এগিয়ে নিতে পারে ততোটা এগিয়ে যায়। সুযোগ সুবিধা আরও সহজলভ্য করতে হবে। তা না হলে একজন গ্রামীণ নারী ঋণ নিয়ে ছাগল পালন করবে, নাকি ধান ক্ষেতে ধানের চাষ করবে; তার সঠিক সমাধান অনেক ক্ষেত্রেই তাদের দেওয়া হয় না। ফলে সে মূলধন অনেক সময় বেশ কিছুটা অপচয়ই হয়ে যায়। এছাড়াও নানা কুসংস্কার এখনো গ্রামীণ নারীদের উন্নয়নের অগ্যযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বাল্যবিয়ে, যৌতুক এদের মধ্যে অন্যতম। আনেক গ্রামীণ নারী সচেতনতা ও সুশিক্ষার অভাবে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে।

নারী শ্রম ও স্বীকৃতি

বাংলাদেশের শতকরা ৪০ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই নারী এবং এর মাঝে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা অধিক। এখনও নারীর অনেক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয় না। এক্ষেত্রে এই কাজগুলোকে তাদের নিত্যদিনের কাজ হিসেবে গণ্য করে তাকে অর্থনীতির বাইরেই রাখা হয়। যেমন ধান মাড়াইয়ের কাজ বা এই জাতীয় কাজগুলোকে নামেমাত্র মূল্য দেওয়া হয়।

এর উপসংহার কি

নারীর অবস্থার উত্তরণ নিয়ে গোটা বিশ্বের সচেতন নাগরিকরা উদ্বিগ্ন। এর সঠিক সমাধান করতে হলে নারী উন্নয়ন সবক্ষেত্রেই সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে। এককেন্দ্রীক চিন্তা করে নারীর উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে সুযোগ অনায়াসে রাজধানীর একজন নারী পেয়ে যান সে সুযোগ গ্রামীণ নারীর কাছে আকাশ কুসুম হয়ে ধরা দিলে নারীর উন্নয়ন অধরাই থেকে যাবে।